International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-V, September 2022, Page No. 44-51
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i5.2022.44-51

প্রাণকেন্দ্রিক মতবাদের একটি তুলনামূলক আলোচনা

হারু মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সোনারপুর মহাবিদ্যালয়, রাজপুর, কলকাতা

Abstract:

Today, conservation of natural environment has become an important topic of discussion in the world. Of course, this is because the greedy man today is desperate to destroy the entire protection system of nature due to his greed. But people learned this aggressive attitude from Judaism and ancient Greek philosophy. In the "Old Testament" creation theory, it is said: "God created his son man and gave him dominion over the world; It is God's intention that the fish of the water, the birds of the air, and all the creatures that move on the earth should fear man as their ruler, and submit to man." Christians generally do not consider cutting down trees or killing animals as wrong because of such references in the early part of the Bible. St. Augustine did not call killing animals and cutting down trees wrong. Aristotle also expressed a similar opinion that the animal world, the plant world and the natural world are for the fulfillment of human needs. Therefore, it will not be considered unjust if the animals, plants and the natural world are destroyed for human needs.

On the other hand, according to the ancient Indian philosophy, everything in the world is intrinsically valuable. Because they are all expressions of joy. Judging from this point of view, if you destroy natural resources, it will be injustice, great sin. Buddhadeva said that "man shall seek the happiness and comfort of all animals, plants and inanimate objects and maintain unobstructed, non-hostile unbounded friendship with all the worlds above, below, and around".The Jain theory of non-violence states that "there is an inextricable link between every living being in nature, so that killing a living being by violent action is in some way killing oneself". So it is good to say that the ancient Indian philosophy is much more humane and conscious to protect the environment and natural resources than the Bible and ancient Greek philosophy. According to Indian philosophy everything in nature is intrinsically valuable. And this idea is probably the only platform to protect the environment and natural resources of today.

Key words: ***Environmental conservation, Intrinsic value, Anthropocentric, Biocentric, Geocentric.***

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়েও মানুষের মনের অভ্যন্তরে এখন শুধুমাত্র একটিই আকুতি এবং তাহল প্রাণের সংরক্ষণ। কেননা বর্তমান সময়ে আমাদের একটি মাত্র স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে "গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও"। একদা পরিবেশ নীতিবিদ্যায় **মানবকেন্দ্রিকতাবাদ** (Anthropocentrism) কে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছিল। তখন মনে করা হতো কেবলমাত্র মানুষেরই স্বতঃমূল্য আছে। তাই কেবলমাত্র মানুষকে সর্বোচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন রূপে গণ্য করে তাঁকে কেন্দ্রে স্থাপন করে মনুষ্যেতর প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বার্থ তথা ভারসাম্যের বিনিময়েও মানুষের স্বার্থই গণনা করা হতো। প্রকৃতি এবং তার পরিবেশ সম্পর্কে পাশ্চাত্যে দুটি অভিমত ব্যাপক ভাবে প্রচলিত, একটি হল "ওল্ড টেস্টামেন্ট" এর মত এবং গ্রীক দর্শনের বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের মত। বলাভালো, এই দুটি মতের ওপর ভিত্তি করেই বোধহয় মানবকেন্দ্রিকতাবাদের উৎপত্তি।

ওল্ড টেস্টামেন্টের সৃষ্টি তত্ত্বে বলা হয়েছে:

"ঈশ্বর তাঁর নিজের মানস পুত্র মানুষকে সৃষ্টি করে সেই মানুষের ওপর জগতের আধিপত্য অর্পণ করেছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রায় হল – জলজীব মাছ, নভচর পাখি এবং বিচরণশীল সমস্ত প্রাণী তাদের অধিপতিরূপে মানুষকে যেন ভয় করে, মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে"। বাইবেলের আদিপর্বে অর্থাৎ 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'এরূপ উল্লেখ থাকার জন্য খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা সাধারণতঃ বৃক্ষছেদন এবং পশুপক্ষী হত্যাকেও ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন। ঈশ্বরের পুত্র মানুষকে হত্যা করা অন্যায় হলেও মানুষের খাদ্যের প্রয়োজনে গো-হত্যা, শূকর-হত্যা অথবা পশুচর্মের জন্য অন্যান্য প্রাণীহত্যা অন্যায় নয় কিংবা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বৃক্ষছেদন অন্যায় নয়। কথিত আছে যিশুখ্রিস্ট কোন এক সময়ে নিজের প্রয়োজনে একটি মহীরূহ বটবৃক্ষ ধ্বংস করেছিলেন এবং একপাল শুকরছানার মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। আর সেই কারণেই বোধকরি খ্রিষ্টান ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিনও পশুহত্যা ও বৃক্ষছেদনকে অন্যায় বলেননি। তাছাড়া খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা আর মনে করেন যে, মানুষ কেবল তার স্রষ্টা ঈশ্বরের নিকট এবং তার প্রতিবেশী মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, মনুষ্যেতর প্রাণীর নিকট তার কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই। তারা শুধু এটাই মনে করেন যে, একমাত্র মানুষের জীবনই স্বকীয়মূল্যে মূল্যবান, মনুষ্যেতর প্রাণী অর্থাৎ পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ ইত্যাদির কোন স্বকীয়মূল্য নেই, মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের ভোগের জন্যই তারা মূল্যবান, বলাভালো এদের মূল্য হল পরকীয়। আর এই কারণেই বোধকরি পশু -পক্ষী হত্যা অথবা বৃক্ষছেদনকে তারা অন্যায় বলেননি। তবে কোনভাবে পশু-পক্ষী হত্যা কিংবা বৃক্ষছেদন যদি মানুষের স্বার্থকে বা প্রয়োজনকে ক্ষুণ্ণ করে, একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই পশু -পক্ষী হত্যা বা বৃক্ষছেদন অনুচিত কাজ বলে গণ্য হয়। যদিও পশু -পক্ষী হত্যা বা বৃক্ষছেদনকে অন্যায়কর্ম বলে মনে করেন না, তথাপিও ইহুদিরা যদৃচ্ছা বৃক্ষছেদন কিংবা পশু -পক্ষী হত্যাকে সমর্থন করেন না এবং পরিবেশ দূষণ সম্পর্কেও প্রতিবাদ করেন। তারা মনে করেন প্রতিটি মানুষের উচিৎ প্রাকৃতিক সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে করে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়। এই কারণেই তাঁরা বলেন জড়জগৎ, উদ্ভিদজগত, এবং প্রাণীজগৎ মানুষের প্রয়োজন সাধনের জন্য বিবর্তিত হলেও মানুষ যেন তাদের উপর বিবেচকের মতো আধিপত্য করে, ভোগদখল করে, যাতে তার নিজের অস্তিত্ব কোন ভাবেই বিপন্ন না হয়। ফলতঃ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা পরিবেশের সুরক্ষাকে কখনই মূল্যহীন বলেন না।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও প্রকৃতি ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে একই অভিমত পোষণ করে বলেছেন যে, উদ্ভিদের প্রয়োজনে আলো – বাতাস –জল – স্থল সমাকীর্ণ জড়জগৎ; পশুপক্ষীদের প্রয়োজনে

উদ্ভিদজগৎ; আর মানুষের প্রয়োজনে সমগ্র প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও জড়জগৎ। কাজেই, অ্যারিস্টটলের মতে মানুষের প্রয়োজনে এদের ধ্বংস করা কোন অন্যায় কাজ রূপে বিবেচিত হতে পারে না।

এপ্রসঙ্গে অপর এক গ্রীক দার্শনিকের নাম উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় হবে বলে মনে হয় না, তিনি হলেন প্রোটাগোরাস। তাঁর মতে, "Man is the measure of all things" অর্থাৎ "মানুষ হল সকল কিছুর পরিমাপক"। এর থেকে বোঝা যায় যে তিনিও মানুষকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন এবং মানুষেরই একমাত্র স্বতঃমূল্য আছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে মানুষই সকল কিছুর নিয়ামক।

একইভাবে শিল্পবিপ্লবের পূর্বে ইংল্যান্ডে বসে ফ্রান্সিস বেকন প্রচার করেছিলেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকৃতি সব কিছুই কেবল মানুষের জন্য, শুধু মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, মানুষের খেয়াল খুশি মেটাবার জন্য।তাঁর মতে,"Our main object is to make nature serve the business of man". শুধু তাই নয় তাঁর মতে, মানুষ নিজেদের খেয়াল খুশি চাহিদা মেটাতেও প্রকৃতিকে বাধ্য করবে।

বিগত দুই শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, প্রকৃতি তথা প্রকৃতির সমগ্র পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ, জড় সব কিছুর উপরই মানুষের প্রভুত্ববাদ সমর্থিত হয়ে এসেছে। দার্শনিক দেকার্ত প্রকৃতির উপর কিভাবে আমরা প্রভুত্ব কায়েম করতে পারি তার জন্য ব্যবহারিক দর্শনের প্রস্তাব করেছেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যবহার করার মধ্যেই আমাদের অগ্রগতি। নির্লজ্জ স্বাজাত্যাভিমান প্রকাশ পেয়েছে ফিকটের এরূপ ঘোষণায় –" I will be the lord of nature and she shall be my servant. Iwill influence her according to the measure of my capacity, but she will have no influence on me".

কিন্তু সমসাময়িক প্রাণকেন্দ্রিক মতবাদ কিংবা ভুমিকেন্দ্রিক মতবাদ উপরোক্ত সকল মতবাদকে এক লহমায় ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছে। সমসাময়িক বাস্তুনীতিবিদ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে যে ধরনের বিভাজন আমরা এতদিন করে এসেছি তা যথার্থ নয়।প্রজাতিবাদের উপর ভিত্তিশীল যে স্বাজাত্যাভিমান তাই মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে নৈতিক বিচারে ম্লান করে দিয়েছে। নিজের প্রজাতি ছাড়াও অপর প্রজাতির সদস্যদের যে স্বগত মূল্য আছে তা স্বীকার না করার মধ্যে কোন সঙ্গত যুক্তি নেই।

এখন আমরা প্রাণকেন্দ্রিক (Bio-centric) মতবাদের সমর্থকদের আলোচনায় দেখতে পাই যে, সেখানে প্রাণমাত্রকেই স্বগত বা স্বতঃমূল্যবান বলে মনে করা হয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন Albert Schweitzer। তাঁর মতে, জগতের প্রতিটি প্রাণের স্বগত অর্থাৎ নিজস্ব মূল্য আছে। তাই প্রাণ ধ্বংস নয়, প্রাণের সংরক্ষণই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। তিনি বলেন, আমরা যদি বিস্ময়াবিষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাই তাহলে শুনতে পাব প্রকৃতি-প্রাণের আহ্বান। তাই তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতঃমূল্যবান জীবনকে তা সে নিজের জীবন হোক কিংবা অন্যের বা নিম্নতর প্রাণী ও উদ্ভিদ যার জীবনই হোক যাবতীয় জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা নৈতিক দিক থেকে কর্তব্য কর্ম বা ভালো কাজ। আর সেই জীবনকে ধ্বংস করতে এগিয়ে যাওয়া হল একপ্রকার অনৈতিক কাজ বা মন্দ কাজ বলে বিবেচিত।

সাম্প্রতিককালে এই প্রাণকেন্দ্রিক মতবাদের সমর্থক হিসেবে আমরা Paul Taylor কে দেখতে পাই। তিনি তাঁর 'The Ethics of Respect for Nature' নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে,যাবতীয় প্রাণবান

সত্ত্বার স্বগত মূল্য আছে এবং এই স্বগত মূল্যের জন্যই তারা নৈতিক বিচারের যোগ্য হওয়ার দাবী রাখে। আর এজন্যই তিনি বলেছেন যে, "To say that an entity has a good of its own is simply to say that without reference to any other entity, it can be benefited or harmed". বস্তুতঃ Taylor তাঁর প্রবন্ধে দুটি নীতির কথা বলেছেনঃ প্রথমটি হল, নৈতিক বিবেচনার নীতি (The principle of moral consideration) এবং দ্বিতীয়টি হল, স্বতঃমূল্যের নীতি (The principle of intrinsic value)। প্রথম নীতির মধ্যে দিয়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তাহল, প্রাণ-রাজ্যের সদস্য হওয়ার দৌলতে প্রতিটি প্রাণবান সত্তা নৈতিকভাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। সংশ্লিষ্ট সত্তাটি কোন প্রজাতির সদস্য তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অপরদিকে, দ্বিতীয় নীতিটির মধ্যে দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, অন্য বিভিন্ন বিষয়ে যতই ভিন্ন হোকনা কেন, যদি কোন সত্তা পৃথিবীর প্রাণ-রাজ্যের সদস্য হয় তাহলে সেই ব্যক্তি-প্রাণীর নিজের ভালো, নিজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের উপলব্ধি স্বগতভাবে মূল্যবান। Taylor এর মতে, কোন সত্তার স্বতঃমূল্য স্বীকার করার অর্থ ওই সত্তাকে নিছক জড়বস্তু বা জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। উক্ত দুটি নীতি থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে, প্রতিটি প্রাণবান সত্তার স্বতঃমূল্য আছে, আর এই কারণেই তারা সকলেই নৈতিক শ্রদ্ধা লাভের যোগ্য। Taylor এর ভাষায়, "To say that it possess inherent worth is to say that its good is deserving of the concern and consideration of all moral agents, and that the realization of its good has intrinsic value, to be pursued as an end in itself and for the sake the entity whose good it is."

Holmes Rolston-III বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ (Deep Echology) এর সমর্থক হলেও প্রাণকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন করে Taylor এর অনুরূপ মতবাদ প্রকাশ করে বলেছেন যে, প্রাণবান সত্তা মাত্রেরই নিজস্ব লক্ষ্য বা অভীষ্ট (a good of their own kind) আছে। যেখানে বেন্থাম শুধুমাত্র প্রাণীর স্বতঃমূল্যের কথা বলেছেন, সেখানে আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে রলস্টন্ বলেন পশু-পাখির জীবন যদি সুবিচার, সহানুভূতি দাবী করতে পারে, তাহলে উদ্ভিদকূলই বা কেন সেই সম্মান, সেই নৈতিক মর্যাদা পাবেনা? এই কারণেই তিনি 'Anthro Logic' ছেড়ে দিয়ে 'Bio Logic' এর আশ্রয় নিতে বলেছেন। তিনি প্রতিটি জীবের অঙ্গ-সংস্থান(Organism) এর মধ্যে যে উদ্দেশ্যমুখিনতা আছে তার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে, প্রতিটি অঙ্গসংস্থানের স্বীয় ইষ্ট বা লক্ষ্য আছে। তিনি দেহ কোষের যে D. N. A. তার মধ্যে এক লক্ষ্যের, এক আদর্শধর্মিতার সন্ধান পেয়েছেন। এই লক্ষ্য অনুভূত লক্ষ্য(felt goal) হতে পারে, আবার অননুভূত লক্ষ্য(non-felt goal)ও হতে পারে। আর এই আদর্শনিষ্ঠতার জন্যই তাদের প্রত্যেকের স্বগত মূল্য স্বীকার করতে হবে বলে তিনি মনে করেন। একই ভাবে তিনি প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্র প্রভৃতি সমষ্টি সত্তার স্বগত মূল্যের প্রস্তাব করেছেন। তিনি গভীর বাস্তুবাদীদের মতো পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধির কথা বলেছেন, এবং তাই বলতে পেরেছেনঃ " The world is my body".

অন্য এক দার্শনিক Robin Attfield ও Taylor বা Rolston এর মতো মনে করেন যে, উদ্ভিদ জগতের প্রতি আমাদের নীতিবোধ প্রসারিত হওয়া উচিৎ। তিনি বলেন যে, বৃক্ষ-গুল্মেরও নিজস্ব লক্ষ্য বা অভীষ্ট আছে, নিজের মতো করে সে বেড়ে ওঠে। মানুষের মতই তারা বড় হয়, আত্ম-রক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। Attfield মূলতঃ মানবিক স্বার্থের আদলে বৃক্ষ-লতার স্বার্থের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যক্তি অথবা বস্তুর(জড় ও প্রাণী) নিজস্ব ভালো মন্দ

আছে। তাছাড়া যাদের নিজস্ব ভালো মন্দ তথা স্বতঃমূল্য আছে, তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের একটা নৈতিক আঙ্গিক আছে।

এখন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি আমরা বিষয়টিকে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি যে বেদ উপনিষদ সেখানে প্রাণকেন্দ্রিক মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে পৃথিবীর সকল প্রাণের স্বতঃমূল্যের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জগতের জড় অজড় সব কিছুই স্বতঃমূল্যবান। এপ্রসঙ্গে ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত ৯০ সূক্তে ঋষিগণ বলেছেন,

"মধুবাতা ঋতায়তেমধুক্ষরন্তিসিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।। ৬
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা।। ৭
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তুসূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ"।। ৮

১/৯০(ঋকবেদ)

অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বভুবন সেই আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম বা আত্মার প্রকাশরূপে নিজ গুনে মধুময় - বায়ু সকল যজমানের জন্য মধু বর্ষণ করে, নদী সমূহ মধু ক্ষরণ করে, ঔষধি সকল মাধুর্যযুক্ত হোক, আমাদের রাত্রি ও ঊষা মধুর হোক, পৃথিবীর বালুকণা ধূলিকণা মাধুর্য বিশিষ্ট হোক, যে আকাশ সকলের পালয়িতা সেই আকাশও মধুযুক্ত হোক, বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হোক, সূর্যও মধুর হোক, ধেনু সকল মধুর হোক। মানুষের জীবনে যে মধুময় আনন্দের প্রকাশ, সমগ্র জগতে তারই প্রকাশ উপলব্ধ হোক, জগতের প্রতিটি বস্তুর স্বতঃমূল্য উপলব্ধ হোক, জীব-অজীব প্রত্যেকের সঙ্গে আত্মিক যোগ উপলব্ধ হোক।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা অনুসারে, যথার্থ ধার্মিক ও নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে প্রাণ তার নিজ গুণে পবিত্র ও মূল্যবান এবং সেজন্য প্রাণবন্ত বা চৈতন্যময় প্রতিটি বস্তুর সুরক্ষা প্রত্যেক মানুষের জীবনে আবশ্যিক পবিত্র কর্তব্য। যথার্থ ধার্মিক ও নীতিবান ব্যক্তি তাই আত্মজ্ঞানে জগতের প্রতিটি বস্তুকে সুরক্ষা করেন। এমন ব্যক্তি কোন প্রাণীকে হত্যা করেন না, বৃক্ষপত্রকে বৃন্তচ্যুত করেন না, পুস্পকে ছিন্ন করেন না, পথ চলা কোন কীটপতঙ্গকে পদদলিত করেন না।

মনু তাঁর মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৪৯নং শ্লোকে বলেছেন -

"অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতা"

অর্থাৎ বৃক্ষাদির ও প্রাণ আছে, চেতনাশক্তি ও অনুভবশক্তি আছে এবং সুখদুঃখ বোধও আছে। কাজেই এদের আত্মজ্ঞানে লালন পালন কর।

অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে -

"তস্নাৎসুবহবোবৃক্ষারোপ্যঃ শ্রেয়োহভিবাঞ্ছতা।
পুত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ তো পুত্রা ধর্মতঃ স্মৃতা।।"

অর্থাৎ মঙ্গলকামী ব্যক্তি মাত্রই বৃক্ষরোপণ করবেন এবং পুত্র স্নেহে তাদের পালন করবেন।

পঞ্চতন্ত্রের কাকোলুকীয়মে ১০৬ নং শ্লোকে বলা হয়েছে -

"বৃক্ষাংশ্চিত্বা পশূণহত্বা রুধির কর্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গে নরকং কেন গম্যতে।।"

অর্থাৎ বৃক্ষছেদন, প্রাণীহত্যা ও রক্তপাত ঘটিয়ে স্বর্গলাভ হয়না, বরং তা নরকেরই পথ প্রশস্ত করে।

কঠোপনিষদের অন্তর্গত দ্বিতীয় বল্লীর ২নং শ্লোকে যমরাজ পরমেশ্বর পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন -

"হংস শুচিষদ্ বসুন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ"।।২।।

২/২/২(কঠোপনিষদ)

অর্থাৎ আত্মা সর্বব্যাপী ও স্বয়ংপ্রকাশ, তিনি অন্তরীক্ষে বিচরণকারী বসু নামক দেবতা, গৃহস্থের অতিথি, যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দানকারী হোতা, তিনি মানুষরূপে, মানুষের উপাস্য দেবতারূপে, পিতৃ-পিতামহরূপে, আকাশে, সত্যে, জলের বিভিন্ন বস্তুতে এবং জলজ প্রাণীরূপে, স্থলে বৃক্ষ, অঙ্কুর, অন্ন, ঔষধিরূপে, যজ্ঞাদি নানা সৎকর্মের প্রার্থিত ফলরূপে, পার্বত্যবস্তু এবং নদনদী রূপে সর্বত্র এক আত্মা (ব্রহ্ম) বিরাজমান। এদের ক্ষতিসাধনের অর্থই হল আত্মবিনাশ।

অথর্ব বেদসংহিতার অন্তর্গত প্রথম অনুবাকের দশম সূক্তের ১৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে –

"পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিদ্যৌঃ শান্তিরূপঃ শান্তিবোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ.....।।"

অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, জলরাশি, ঔষধিসকল এবং বনস্পতিসমূহ হিংসা মুক্ত হোক, মঙ্গলময় হোক।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতীয় ধ্যান ধারণায় বিশ্বপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কেননা মানুষ এবং বিশ্বপ্রকৃতি এই দুইকে নিয়েই হল ঔপনিষদিক এক। শুধুমাত্র মানুষেরই নয়, মানুষ ছাড়া অন্যান্য নিম্নতর প্রাণী এবং জড়েরও যে স্বতঃমূল্য আছে সেকথা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে ভারতীয় বেদ পুরাণাদিতে তা উপরোক্ত উদ্ধৃতি গুলি থেকে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাস্তুসংহতি (Ecology) প্রসঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারাকে ব্যক্ত করার গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করে বলেছেন যে,

"ওঁ ভূর্ভবঃ স্বঃ তৎস্যবিতুর্বরেণ্যং ভার্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনং প্রচোদয়াৎ।"

অর্থাৎ একদিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা – এই দুইকে নিয়েই যিনি এক শান্তি বিকীর্ণ করছেন এবং এই দুইয়ের মধ্যে যিনি অনবরত আনন্দের প্রসার ঘটাচ্ছেন, তাঁকে, তাঁর সেই শক্তিকে, বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করার মন্ত্রই হল এই গায়ত্রী। এই গায়ত্রী মন্ত্র হল বিশ্বপ্রকৃতির সকল ব্যক্তি ও বস্তুর (জীব ও জড়) সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মজ্ঞানে তাদের সংরক্ষণ মন্ত্র। সর্বব্যাপী পরমব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান হওয়ায় পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বৃক্ষ-তরুলতা, কীটপতঙ্গ, মনুষ্যেতর পশু-প্রাণী ইত্যাদির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের কোন ভেদাভেদ নেই। সবই অদ্বয় ব্রহ্ম বা আত্মার বহু বিচিত্র প্রকাশ। বোধকরি, এই কারণেই এই বিশ্বের জড় - অজড় সব কিছুকেই আত্মজ্ঞানে সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করাই হল মানবধর্ম। ঔপনিষদীয় মুনি -ঋষিরা যে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন তার মূলে ছিল বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত জড় – অজড়, প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে তাঁদের হার্দিক সম্পর্কের উপলব্ধি, তাঁদের মমত্ববোধ এবং সর্বোপরি তাঁদের ধর্মীয় এবং বিশেষ করে নৈতিক ভাবাদর্শ।

অন্যদিকে নাস্তিক দার্শনিক জৈনগণও সকল প্রকার জীব ধ্বংসকে বলাভালো জীব হত্যাকে তাদের 'অর্হৎ' বা 'কেবলজ্ঞান' লাভের পরিপন্থী বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন "ন হন্যেত ন ঘাতয়েত" অর্থাৎ হনন করবে না, হননের কারণ হবে না। তাঁরা কেবলজ্ঞান লাভের অঙ্গ হিসেবে 'অহিংসা' কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ বলে মনে করেন, এবং তাঁদের মতে কায়, মন, বাক্যে কোন জীবের (তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন) ক্ষতি না করা, ক্ষতির চিন্তা না করাই অহিংসা। এই অহিংসার মাধ্যমেই অর্হৎ লাভ সম্ভব

বলে মনে করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, জৈন নীতিদর্শনেও সকল প্রকার জীব হত্যা নিষিদ্ধ। জৈন নীতিদর্শনে একথা স্বীকার করা হয় যে, শুধুমাত্র মানুষই নয় অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণী, পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, স্থলচর, জলচর সকল বস্তুরই স্বগতমূল্য আছে অর্থাৎ তারা স্বকীয় মুল্যে মূল্যবান এবং তাদেরও মুক্তি লাভের আকাংক্ষা ও অধিকার আছে। যদিও একথা সত্য যে, মোক্ষ বা মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে জৈন দর্শনে অহিংসাব্রত পালনের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এর ফলে অর্থাৎ অহিংস পথ অনুসরণের মধ্য দিয়ে বস্তুজগতে পরিবেশ ও জীব জগতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

বৌদ্ধদর্শনে 'ধর্ম' বলতে নীতিনিষ্ঠ কর্মকে বোঝান হয়েছে, যাকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বাস্তুসংস্থানের পূর্বাভাসরূপে গণ্য করা যায়। গৌতম বুদ্ধের মতে, অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সৎকর্মের দ্বারা জড়জগৎ ও জীবজগতের কল্যান সাধক কর্মের অনুষ্ঠানই ধর্ম; এছাড়া ধর্মের আর কোন লক্ষণ বা অর্থ নেই। তিনি বলেন, হিংসাকে অবলম্বন করে যাগযজ্ঞ উপলক্ষ্যে বৃক্ষাদি ছেদন ও পশুবলি ধর্মের আবরণে একান্তই অধর্ম। কেননা তাতে কোন রকমের মঙ্গল সাধিত হয়না। নিজের ভোগের জন্য জীবহত্যা নিতান্তই অধর্ম। বুদ্ধদেব বলেন, যাঁর ভাবনা বিশ্বভুবনের প্রতিটি বস্তুতে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে বিহার বা ভ্রমণ করে, তিনি শয়নে স্বপ্নে ও জাগরণে এমন মঙ্গল -চিন্তায় বা ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন –

"সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু" – সব জীব সুখী হোক।

"অবেরা হোন্তু" – জীব মাত্রই শত্রুহীন হোক।

"অব্যাপজঝা হোন্তু – সুখী অত্তানং পরিহরন্তু" – সকল জীব সুখী আত্মারূপে জীবনযাপন করুক।

"সবে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু" – কোন জীব তার ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।

-এমন চিন্তা বা ভাবনাতে চিত্তকে প্রসারিত করে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে পরমানন্দ লাভই হল ব্রহ্মবিহার । হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি কলুষ থেকে চিত্তের মুক্তিই হল ব্রহ্মবিহার ভাবনা। বুদ্ধদেবের এমন চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণের পূর্বাভাসটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যাইহোক, বুদ্ধদেবের ব্রহ্মবিহার ভাবনার অন্তর্গত অহিংসা সম্মত মৈত্রীভাবনা পরিবেশকে সুরক্ষিত রেখে সমগ্র জীবজগতের মঙ্গলসাধন করেছে একথা বলাই বাহুল্য।

মন্তব্যঃ সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, হিংসায় উন্মত্ত আজকের বিশ্ব যখন মানুষের, প্রাণীর, উদ্ভিদের এবং প্রাণের উপযোগী পরিবেশ সমূহকে ক্ষতিসাধন করা ধরাপৃষ্ঠে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমগ্র প্রাণীজগতের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে, তখন বেদ-উপনিষদের কিংবা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হলেই এই প্রাণঘাতী ভয়াবহ সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে আমার বোধ হয়। শুধুমাত্র মানুষই নয় সকল প্রকার প্রাণের (জীব অথবা জড়ের) সংরক্ষণ আজকের দিনে একান্ত জরুরি। এই সংরক্ষণ প্রতিটি জীবের স্বগতমূল্য বা স্বতঃমূল্যের জন্য করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। কেননা আমার মতে প্রতিটি জীব মাত্রই স্বতঃমূল্যবান। আর স্বতঃমূল্যবান প্রাকৃতিক উপাদানকে বিনাশ করে আর যাইহোক প্রকৃতির মঙ্গল সাধন কখনোই সম্ভবপর নয়। প্রাকৃতিক উপাদান সংরক্ষণের মাধ্যমেই সর্বপ্রকার মঙ্গলকর্ম সাধন সম্ভব বলে আমার মনে হয়। তাই যেকোনো মূল্যেই হোক আমাদেরকে প্রাকৃতিক সম্পদ তথা উপাদানকে সংরক্ষণ করা উচিত। এই একটি মাত্র উপায়েই আমাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী:

১) উপনিষদ্, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৯।
২) গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০৭
৩) চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, পরিবেশ ও নীতিবিদ্যা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৯।
৪) দত্ত, রমেশ চন্দ্র, ঋকবেদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩।
৫) পাল, ডঃ সন্তোষ কুমার, ফলিত নীতি শাস্ত্র, লেভান্ত বুকস্, কলকাতা, ২০১৭।
৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, মনুসংহিতা, সদেশ, কলকাতা, ১৪১২।
৭) ভট্টাচার্য, ডঃ সমরেন্দ্র, ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৪।